যুগান্তর

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ে যেসব কারণে পিছিয়ে পড়েছি

প্রকাশ : ১১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. কাজী ছাইদুল হালিম

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং। ছবি: সংগৃহীত

এই বিশ্বায়নের যুগে যে কোনো প্রতিষ্ঠান, সেটা সরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন বা স্বেচ্ছাসেবী যাই হোক না কেন, তার টিকে থাকা এবং সাফল্য অর্জন করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্বীকৃতি একটা গুরুত্বপূর্ণই ব্যাপার।

স্বীকৃতিহীনতা সাধারণত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতার ভিতকে দুর্বল করে দেয়। স্বীকৃতিহীন প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং দ্রব্যের চাহিদা সমাজে কমতে থাকে, ভোক্তারা বিকল্প পণ্যের সন্ধান

করতে থাকে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৯ সালের এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং, যাতে রয়েছে এশিয়ান শীর্ষ ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। অতি দুঃখজনক হলেও তা বাস্তব সত্য যে, সেই এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থান পায়নি।

এই যে এশিয়ান শীর্ষ ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯ সালের র‍্যাঙ্কিং তালিকায় বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েরও স্থান হল না, এর পটভূমি কী তা অনুসন্ধান করা এখন অতীব জরুরি। কারণ এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে হয়তো একই অবস্থা আগামীতেও ঘটতে পারে। আর এর ফলে আরও বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি ছাত্র বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী হতে পারে।

কমে যেতে পারে বাংলাদেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সংচিতি। অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে হ্রাস পেতে পারে বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের চাহিদা, আর বেড়ে যেতে পারে বিদেশি পরামর্শক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ এবং বিপণনবিদের চাহিদা।

যে দেশই হোক না কেন, শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যেটা অপরিহার্য তা হল একটা উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ। আর এ উপযুক্ত পরিবেশের অভাবেই শিক্ষার মান কমে যায়; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা হারায় আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্বীকৃতি। যে কোনো শিক্ষা পরিবেশের প্রধান ও প্রথম উপাদান হচ্ছে একটি যুগোপযোগী পাঠক্রম, যা ভবিষ্যতের কর্মের চাহিদা পূরণ করবে। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে দক্ষ শিক্ষকসমাজ, যারা যুগোপযোগী শিক্ষাদান বাস্তবায়ন করবেন।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 'যেমন গুরু তেমন শিষ্য'। তাই এটা অনস্বীকার্য, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির পূর্বশর্ত হচ্ছে দক্ষ ও সৃজনশীল শিক্ষকসমাজ সৃষ্টি করা। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হচ্ছে শিক্ষার জন্য মানসম্মত অবকাঠামো, যার মধ্যে থাকতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, শ্রেণীকক্ষ, পরীক্ষাগার, কম্পিউটারকক্ষ, চিকিৎসাকেন্দ্র, পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার, ক্রীড়া সুবিধা, ভোজনালয়, বিশ্রামকক্ষ, মিলনায়তন, ছাত্রাবাস এবং অপরিহার্য পণ্যের দোকান।

গুণগত শিক্ষার জন্য এ তিনটি উপাদান একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত এ তিনটি উপাদান কীভাবে অবদান রাখছে যুগোপযোগী এবং মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে। যদি কোথাও কোনো দুর্বলতা থাকে, তা কীভাবে সমাধান করা যায় তাও ভাবতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সবকিছুর মূলে বা সঙ্গে কিন্তু অর্থ জড়িত না, অনেক কিছুর মূলে ইচ্ছাই মূল শর্ত, আবার অনেক কিছুর মূলে উদ্যোগ হচ্ছে প্রধান শর্ত। তাই যেটার সঙ্গে অর্থ জড়িত তা অর্থ দিয়ে সমাধান করতে হবে, আর যেটার সঙ্গে ইচ্ছা জড়িত তা ইচ্ছা দিয়ে সমাধান করতে হবে এবং উদ্যোগেরটা উদ্যোগ দিয়ে।

বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ, তাই সবকিছু হয়তো আমরা সবসময় উন্নত দেশগুলোর মতো করে করতে পারব না, যার কারণ হতে পারে অর্থনৈতিক সমস্যা, যথাযথ উদ্যোগের অভাব, দক্ষতার অপ্রতুলতা এবং ইচ্ছাশক্তির অনুপস্থিতি। উল্লিখিত এ কারণগুলো সত্ত্বেও, কালবিলম্ব না করে, বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচার করে উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমাদের কাজ শুরু করা উচিত।

সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ইউজিসি প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা এবং দুর্বলতা ও বাহ্যিক সুযোগ এবং হুমকি বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করার তাগিদ দিতে পারে। একইভাবে প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রতিটা বিভাগকে নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা এবং দুর্বলতা ও বাহ্যিক সুযোগ এবং হুমকি বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করার তাগিদ দিতে পারে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান যে লেজেগোবরে অবস্থা, তা থেকে উত্তরণের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের কোনো বিকল্প নেই, আর তাই আমাদের কালবিলম্ব না করে কাজ শুরু করা উচিত এখনই। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা; বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ যাবে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বাকিরা যাবে ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এ ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং জার্মানির উচ্চশিক্ষা-আদল নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি হবে দুই ভাগে বিভক্ত- স্নাতক (ব্যাচেলর) এবং স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স)। ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করার পর সরাসরি যাবে কর্মক্ষেত্রে। তবে ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা মাস্টার্স করতে পারবে ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু তিন থেকে চার বছর কর্ম অভিজ্ঞতার পর।

অন্যদিকে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনো বিরতি ছাড়াই ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যন্ত সমাপ্ত করতে পারবে। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে বিশেষ করে গবেষণাভিত্তিক আর ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য পেশাজীবী তৈরির কারখানা।

বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা এবং প্রকাশনায় বিশেষ নজর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, গবেষণা ছাড়া কখনই নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয় না। আর ধার করা জ্ঞানে কিন্তু একটা জাতি সামনে এগিয়ে যেতেও পারে না। বাংলাদেশ যেহেতু একটি উন্নয়নশীল দেশ, তাই সবসময় সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত পরিমাণ অর্থ গবেষণা এবং প্রকাশনার জন্য বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে সমাজের বিত্তবান এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে।

ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই কিন্তু বিত্তবান এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিশেষ করে গবেষণা এবং প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উন্নত দেশগুলোয় প্রায় প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন করে দায়িত্বশীল ব্যক্তি দান বা ডোনেশন সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকেন।

যিনি বিভিন্ন বিত্তশালী ব্যক্তি, ফাউন্ডেশন এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন দান সংগ্রহের জন্য। আমার বর্তমান কর্মস্থল তামপেরে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপলাইড সায়েন্সের (TAMK) রেক্টরের অনেক কাজের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইচ্ছা করলে ঞঅগক-এর ডোনেশন সংগ্রহ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে গবেষণা ও প্রকাশনার অর্থ সংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে।

বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় উভয়কেই সমাজের চাহিদা অনুযায়ী কর্মজীবনবান্ধব এবং প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে আর এ জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত হবে সবসময় সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্বক্ষণিকভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রবণতা অনুসরণ করতে হবে আর এভাবেই হালনাগাদ করতে হবে পাঠক্রম এবং শিক্ষাদাতাদের দক্ষতা। পাঠক্রমে তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে, আংশিক শিক্ষাকে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে ভবিষ্যতের কর্মস্থলে সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বলব ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম প্রতিটা বিষয়ে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

এ বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে প্রতিদিন। এমতাবস্থায় প্রায়ই আমরা দেখতে পাই একজন ব্যক্তি এক দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, অন্য আরেকটা দেশে পড়াশোনা করেছেন, আবার তৃতীয় একটা দেশে চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে জাতীয় পর্যায়ে অর্জিত শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

আর এ জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগ্রহী করে তুলতে হবে বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় প্রথার প্রচলন করতে, যাতে উভয়ে উভয়ের দক্ষতা ও জ্ঞান দ্বারা লাভবান হতে পারে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা এবং সম্মিলিতভাবে কিছু কিছু বিষয় বা কোর্স পড়ানো যেতে পারে। অধিকন্তু, বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডাবল ডিগ্রি প্রথারও প্রচলন করা যেতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থায় আইসিটির নিবিড় সংযোগ ঘটাতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় আইসিটির সংযোজন বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ই-মেইল আর বাড়ির কাজ বা অন্যান্য কাজ জমা দেয়ার ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষকের বিভিন্ন ক্লাসের নোট, উপস্থাপনাপত্র, গবেষণাপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে যা ইন্টারনেট সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে নেয়া বা দেয়া যাবে।

অধিকন্তু শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার পাশাপাশি কিছু কিছু বিষয় বা কোর্স সম্পূর্ণ বা আংশিক অনলাইনে পড়ানো যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার বাংলাদেশে ই-বিজনেসের দ্রুত প্রসার ঘটাতে সহায়ক হতে পারে। ই-বিজনেস হবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যবসা মডেলগুলোর অন্যতম।

আমরা যদি এখনই আমাদের উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ শুরু করি, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করি, তাহলে সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যেদিন শুধু আসিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়েই নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়েও আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিতে পারবে। এখন এগিয়ে যাওয়ার পালা।

ড. কাজী ছাইদুল হালিম : ফিনল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশি, শিক্ষক ও গবেষক